গল্প

আলো ও ছায়া

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

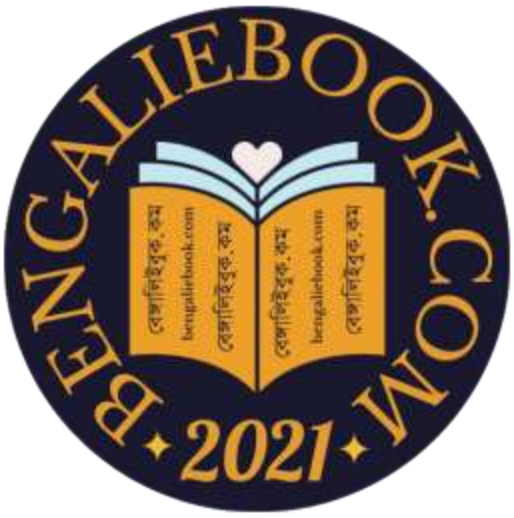

আলো ও ছায়া

এক

প্রথমেই যদি তোমরা ধরিয়া ব' স, এমন কখখনো হয় না, তবে ত আমি নাচার। আর যদি বল হইতেও পারে—জগতে কত কি যে ঘটে, সবই কি জানি? তা হলে এ কাহিনী পড়িয়া ফেল; আমার বিশ্বাস, তাহাতে কোন মারাত্মক ক্ষতি হইবে না। আর গল্প লিখিতে এমন কিছু প্রতিজ্ঞা করিয়া বসা হয় না যে, সবটুকু খাঁটি সত্য বলিতে হইবে। হ' লই বা দু-এক ছত্র ভুল, হ'লই বা একটু-আধটু মতভেদ—এমনই বা তাহাতে কি আসে যায়? তা নায়কের নাম হইল যজ্ঞদত্ত মুখুজ্যে—কিন্তু সুরমা বলে আলোমশাই। নায়িকার নাম ত শুনিলে, কিন্তু যজ্ঞদত্ত তাকে বলে ছায়াদেবী। দিন-কতক তাহাদের ভারী কলহ বাধিয়া গেল, কে যে আলো—কে যে ছায়া, কিছুতেই মীমাংসা হয় না; শেষে সুরমা বুঝাইয়া দিল, এটা তোমার সূক্ষ্মবুদ্ধিতে আসে না যে, তুমি না থাকিলে আমি কোথাও নাই—কিন্তু আমি না থাকিলে তুমি চিরকাল চিরজীবী; তাই তুমি আলো, আমি ছায়া।

যজ্ঞদত্ত হাসিল, এক তরফা ডিগ্রী পেতে চাও কর, কিন্তু বিচারটা কোন কাজের হ'ল না।

সুরমা। খুব হয়েছে, বেশ হয়েছে, চমৎকার হয়েছে আলোমশাই, আর ঝগড়া করতে হবে না। তুমি আলোমশাই, আমি শ্রীমতী ছায়াদেবী। বলিতে বলিতে ছায়াদেবী নানারূপে আলোমশাইকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল।

গল্পের এতটুকু ত হ'ল। কিন্তু এইবার তোমাদের সঙ্গেই দ্বন্দ্বযুদ্ধ না বাধিয়া গেলে বাঁচি। তুমি কহিবে, ইহারা স্ত্রী-পুরুষ; আমি কহিব, স্ত্রী-পুরুষ বটে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রী নয়। নিশ্চয় তুমি চোখ রাঙ্গাইবে, তবে কি অবৈধ প্রণয়? আমি বলিব, খুব শুদ্ধ ভালবাসা।

কিছুতেই তোমরা তাহা বিশ্বাস করিবে না, মুখ ভার করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, কত বয়স? আমি কহিব, আলোর বয়স তেইশ, আর ছায়ার বয়স আঠার। এর পরেও যদি শুনিতে চাও, আরম্ভ করিতেছি।

যজ্ঞদত্তের ছোট করিয়া দাড়ি ছাঁটা, চোখে চশমা, মাথায় ল্যাভেন্ডারের গন্ধ, পরনে কুঞ্চিত ঢাকাই কাপড়, সার্টে এসেন্স মাখান, পায়ে মখমলের কাজ-করা শ্লিপার—ছায়া স্বহস্তে ফুল তুলিয়া দিয়াছে। লাইব্রেরিতে এক-ঘর পুস্তক, বাটীতে বিস্তর দাসদাসী। টেবিলের ধারে বসিয়া যজ্ঞদত্ত পত্র লিখিতেছিল। সম্মুখে মস্ত মুকুর। পর্দা সরাইয়া ছায়াদেবী সাবধানে প্রবেশ করিল।

ইচ্ছা, চুপি চুপি চোখ টিপিয়া ধরে; পিঠের কাছে আসিয়া হাত বাড়াইতে গিয়া সম্মুখে দর্পণে নজর পড়িল। দেখিল, যজ্ঞদত্ত তাহার মুখপানে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। সুরমাও হাসিয়া ফেলিল; বলিল, কেন দেখে ফেললে?

যজ্ঞ। সেটা কি আমার দোষ?

সুরমা। তবে কার?

যজ্ঞ। অর্ধেকটা তোমার, আর অর্ধেকটা ঐ আরশিখানার।

সুরমা। এখনই আমি ওটা ঢেকে দেব।

যজ্ঞ। তা দিও, কিন্তু বাকীটার কি হবে?

সুরমা বার-দুই নড়িয়া চড়িয়া কহিল, আলোমশাই!

যজ্ঞ। কেন ছায়াদেবী?

সুরমা। তুমি রোগা হয়ে যাচ্চ কেন?

যজ্ঞ। তা ত আমার বিশ্বাস হয় না।

সুরমা। তুমি খাও না কেন?

যজ্ঞদত্ত হাসিয়া উঠিল—সুরো, কোন্দল করতে এসেচ?

সুরমা। হুঁ।

যজ্ঞ। আমি তাতে রাজী নই।

সুরমা। তুমি বিয়ে করবে না কেন?

যজ্ঞ। সে জবাব ত রোজই একবার করে দিয়ে এসেচি!

সুরমা। না, করতেই হবে।

যজ্ঞ। সুরো, তুমি একটি বিয়ে কর না কেন?

সুরমা যজ্ঞদত্তের হাত হইতে পত্রখানি কাড়িয়া লইয়া কহিল, ছিঃ, বিধবার কি বিয়ে হয়?

যজ্ঞদত্ত খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কে জানে? কেউ বলে হয়, কেউ বলে হয় না।

সুরমা। তবে আমাকে এ নিমিত্তের ভাগী করবার চেষ্টা কেন?

যজ্ঞদত্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তবে কি চিরকাল শুধু আমারই সেবা করে কাটাবে?

হুঁ, বলিয়া সে ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

যজ্ঞদত্ত অশ্রু মুছাইয়া দিয়া কহিল, সুরো, কি তোমার মনের সাধ, আমাকে খুলে বলবে না?

সুরমা। আমাকে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দাও।

যজ্ঞ। আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে?

সুরমার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না—দক্ষিণে ও বামে বার-দুই মাথা নাড়িতে গিয়া চোখের জল উৎসের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

.

দুই

সুরমা। যজ্ঞদাদা, সেই গল্পটা আবার বল না!

যজ্ঞ। কোন্‌টা সুরো?

সুরমা। সেই যে আমাকে যবে বৃন্দাবনে কিনেছিলে। কত টাকায় কিনেছিলে গো?

যজ্ঞ। পঞ্চাশ টাকায়। আমার তখন আঠার বছর বয়স। বি. এ. এক্‌জামিন দিয়ে পশ্চিমে বেড়াতে যাই। মা তখন বেঁচে, তিনিও সঙ্গে ছিলেন। একদিন দুপুরবেলায় মালতী-কুঞ্জের ধারে একদল বৈষ্ণবী গান গাইতে আসে, তারই মধ্যে প্রথম তোমাকে দেখতে পাই।

যৌবনের প্রথম ধাপটিতে পা দিয়ে জগৎটাকে এমন সুশ্রী দেখতে হয় যে, শুধু নিজের দুটি চোখে সে মাধুর্য সবটুকু উপভোগ করতে পারা যায় না; সাধ হয়, মনের মতন আর দুটি চোখ এমনি করে একসাথে এমনি শোভা সম্ভোগ করতে পারে যদি তাকে বুঝিয়ে বলতে পারি—ও কি সুরমা, কাঁদচ যে?

সুরমা। না—তুমি বল।

যজ্ঞ। তুমি তখন তের বছরের নবীন বৈষ্ণবী, হাতে মন্দিরা, গান গাইছিলে।

সুরমা। যাও—আমি বুঝি গান গাইতে পারি?

যজ্ঞ। তখন ত পারতে, তার পর অনেক পরিশ্রমে তোমাকে পাই, তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, বালবিধবা। মা তোমার তীর্থে এসে আর ফিরে যেতে পারেন নি—স্বর্গে গিয়েচেন। আমার মার কাছে তোমায় এনে দিই, তিনি বুকে তুলে নিলেন—তার পর মৃত্যুকালে আবার আমাকেই ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন।

সুরমা। যজ্ঞদাদা, আমার বাড়ি কোথায়?

যজ্ঞ। শুনেছি, কৃষ্ণনগরের কাছে।

সুরমা। আমার আর কেউ নেই?

যজ্ঞ। আমি আছি, তাই যে তোমার সব, সুরমা।

সুরমার চক্ষু আবার জলে ভিজিয়া আসিল, কহিল, তুমি আমাকে আবার বেচতে পার?

যজ্ঞ। না, তা পারি না। নিজেকে না বেচে ফেললে ওটি কিছুতেই হতে পারে না।

সুরমা কথা কহিল না, তেমনিভাবে সজল-নয়নে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে কহিল, তুমি দাদা, আমি ছোট বোন—আমাদের দু'জনার মাঝখানে একটি বৌ আন না দাদা!

যজ্ঞ। কেন বল দেখি?

সুরমা। সমস্ত দিন ধরে সাজিয়ে গুজিয়ে তাকে আমি তোমার কাছে বসিয়ে রাখব।

যজ্ঞ। তা কি প্রাণ ধরে পারবে?

সুরমা মুখ তুলিয়া চোখের উপর চোখ পাতিয়া কহিল, আমি কি তেমনি অধম যে হিংসা করব?

যজ্ঞ। হিংসা নাই করলে, কিন্তু নিজের স্থানটি বিলিয়ে দেবে?

সুরমা। বিলিয়ে কেন দিতে যাব! আমি রাজা, রাজাই থাকব, শুধু একটি মন্ত্রী বাহাল করব, দু'জনে মিলে তোমার রাজ্যটা চালাতে আমোদ হবে।

যজ্ঞ। দেখ ছায়া, বিবাহে প্রবৃত্তি নেই, কিন্তু তোমার যদি একজন সাথীর বড় প্রয়োজন হয়ে থাকে ত বিবাহ করব।

সুরমা। হাঁ, নিশ্চয় কর, খুব আমোদ হবে; দু'জনে খুব মনের সুখে দিন কাটাব। মনে মনে কহিল, তিন কুলে আমার কেউ নাই, আমার মান-অপমান তাও নাই, কিন্তু তুমি কেন আমাকে নিয়ে বিশ্বের কলঙ্ক কুড়াবে? দেবতা আমার! তুমি বিবাহ কর, তোমার মুখ চেয়ে আমার সব সইবে।

.

তিন

কলিকাতায় প্রতিবাসীর খবর অনেকে রাখে না। অনেকে আবার খুব রাখে। যাহারা রাখে তাহারা বলে, যজ্ঞদত্ত এম. এ. পাস করুক, কিন্তু বয়াটে ছেলে। ইশারায় তাহারা সুরমার কথাটা

উল্লেখ করে। সুরমা ও যজ্ঞদত্ত মাঝে মাঝে তাহা শুনিতে পায়। শুনিয়া দুইজনে হাসিতে থাকে।

কিন্তু তুমি ভাল হও আর মন্দ হও, বড়মানুষ হইলে তোমার বাড়িতে লোক আসিবেই, বিশেষ মেয়েমানুষ। কেহ বা বলে, সুরমা, তোমার দাদার বিয়ে দাও না?

সুরমা। দাও না দিদি, একটি ভাল মেয়ে খুঁজে-পেতে।

যে সুরমার সখী সে হাসিয়া ফেলে—তাইত, ভাল মেয়ে মেলা শক্ত, তোমার রূপে যার চোখ ভরে আছে, —তার—

দূর, পোড়ারমুখী! বলিতে বলিতে কিন্তু সুরমার সমস্ত মুখমন্ডল স্নেহ ও গর্বে রঞ্জিত হয়ে উঠে।

সেদিন দুপুরবেলা ঝুপঝাপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, সুরমা ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, একটি মেয়ে পছন্দ করে এলাম।

যজ্ঞদত্ত। আঃ একটা দুর্ভাবনা গেল। কোথায় বল দেখি?

সুরমা। ও-পাড়ার মিত্তিরদের বাড়ি।

যজ্ঞদত্ত। বামুন হয়ে কায়েতের ঘরে?

সুরমা। কায়েতের ঘরে কি বামুন থাকতে নেই? তার মা ও-বাড়িতে রেঁধে খেতো, মেয়েটি শুনেচি ভাল; দেখে এসে যদি মনে ধরে ত ঘরে আন।

যজ্ঞদত্ত। আমি কি এমনি হতভাগা যে, রাজ্যের ভিখিরি ছাড়া আমার অন্ন জুটবে না!

সুরমা। ভিখিরি কুড়িয়ে আনা কি তোমার নূতন কাজ?

যজ্ঞদত্ত। আবার!

সুরমা। না যাও, দেখে এস। মনে ধরে ত না ব'ল না।

যজ্ঞদত্ত। মনে কিছুতেই ধরবে না।

সুরমা। ধরবে গো ধরবে—একবার দেখেই এস না।

ছায়াদেবী তখন আলোমশাইকে এমন সাজাইয়া দিল, এত গন্ধ লাগাইয়া মাজিয়া ঘষিয়া চুল আঁচড়াইয়া দিয়া এমনিভাবে আরশির সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিল যে, যজ্ঞদত্তের লজ্জা করিত লাগিল। ছিঃ, এ যে বড় বাড়াবাড়ি হয়ে গেল।

সুরমা। তা হোক, দেখে এস।

গাড়ি করিয়া যজ্ঞদত্ত মেয়ে দেখিতে গেল। পথে একজন বন্ধুকেও তুলিয়া লইল। চল, মিত্তির বাড়িতে জলযোগ করে আসি।

বন্ধু। তার মানে?

যজ্ঞদত্ত। সে বাড়িতে একটা ভিখিরি মেয়ে আছে। তাকে বিয়ে করতে হবে।

বন্ধু। বল কি, এমন প্রবৃত্তি কে দিলে?

যজ্ঞদত্ত। তোমরা যার হিংসেয় মরে যাও তিনিই, সেই ছায়াদেবী।

যজ্ঞদত্ত বন্ধুকে লইয়া মেয়ে দেখিতে ঘরে ঢুকিলেন। মেয়ে কার্পেটের আসনের উপর বসিয়া, পরনে দেশী কাপড়, কিন্তু অনেক ধোপপড়া সূতাগুলা মাঝে মাঝে জালের মত হইয়া গিয়াছে। হাতে বেলোয়ারি চুড়ি এবং একজোড়া পাক দেওয়া তামার মত রংয়ের সোনার বালা—মাঝে মাঝে এক-এক জায়গায় ভিতরের গালাটা দেখা যাইতেছে। মাথায় এত তেল যে কপালটা পর্যন্ত চকচক করিতেছে, ব্রহ্মতালুর উপর শক্ত খোঁপাটা কাঠের মত উঁচু হইয়া আছে। দুই বন্ধুতে মুখ টিপিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। হাসি চাপিয়া মেয়েটির দিকে চাহিয়া যজ্ঞদত্ত কহিল, কি নাম তোমার?

মেয়েটি বড় বড় কালো চোখ দুটো শান্তভাবে তাহার মুখের প্রতি রাখিয়া কহিল, প্রতুল।

যজ্ঞদত্ত বন্ধুর গা টিপিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, ওহে, গদাধর নয় ত?

বন্ধু ঈষৎ ঠেলিয়া দিয়া কহিল, জ্যাঠামি করো না, তাড়াতাড়ি পছন্দ করে নাও।

হাঁ, এই নিই—

বেশ—বেশ, কি পড়?

কিছু না।

আরো ভালো।

কাজ-কর্ম করতে জান?

প্রতুল মাথা নাড়িল—নিকটে একজন ঝি দাঁড়াইয়াছিল, সে ব্যাখ্যা করিয়া দিল—ভারী কর্মী মেয়ে বাবু, রাঁধা-বাড়া সংসারের কাজ-কর্মে মায়ের হাত পেয়েচে। আর, মুখে কথাটি নেই—ভারী শান্ত।

তা বুঝেছি।

তোমার বাপ বেঁচে নেই?

না।

মাও মরে গেছেন?

হাঁ।

যজ্ঞদত্ত দেখিল, এই হাবা মেয়েটার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছে।—তোমার কি কেউ নেই?

না।

আমার বাড়ি যাবে?

সে ঘাড় নাড়িল, হুঁ। এই সময় জানালার দিকে নজর পড়ায় সে দেখিল খড়খড়ির ফাঁক দিয়া দুটো কালো চোখ যেন অগ্নিবর্ষণ করিতেছে, ভয় পাইয়া সে বলিল, না।

বাহিরে আসিয়া মিত্তিরমহাশয়ের সাক্ষাৎলাভ।

কেমন দেখলেন?

বেশ।

বিবাহের তবে দিন স্থির হোক।

হোক।

.

চার

বার-তের বৎসরের বালকের হাত হইতে কোন নির্দয় রসহীন অভিভাবক তাহার অর্ধ-পঠিত কৌতুকপূর্ণ নভেলটা টানিয়া লুকাইয়া রাখিয়া দিলে তাহার যেমন অবস্থা হয়, ভিতরের প্রাণটা ব্যাকুলভাবে সেই শুষ্কমুখ শঙ্কিত বালককে এ-ঘর ও-ঘর ছুটাইয়া লইয়া বেড়ায়, ভয়ে ভয়ে তীব্র চক্ষু দুটি শুধু যেমন সেই প্রিয় পদার্থটিকে আবিষ্কার করিবার জন্য ব্যস্ত এবং বিরক্ত হইয়া থাকে, আর সর্বদাই যেন কাহার উপর রাগ করিতে ইচ্ছা করে, তেমনিভাবে সুরমা যজ্ঞদত্তের জন্য ছটফট করিতে লাগিল। কি যেন কি একটা খুঁজিয়া বাহির করিবে। চেয়ার, বেঞ্চ, সোফা, শয্যা, ঘর, বারান্দা—সবগুলার উপরেই সে বিরক্ত

হইয়া উঠিল। রাস্তার দিকের একটা জানালাও তাহার পছন্দ হইল না, একবার এটাতে, একবার ওটাতে বসিতে লাগিল। যজ্ঞদত্ত ঘরে ঢুকিলেন।

কি হ'ল আলোমশাই? আলোমহাশয়ের মুখ গম্ভীর।

সুরমা। পছন্দ হল?

যজ্ঞ। হ' ল।

সুরমা। কবে বিয়ে?

যজ্ঞ। বোধ হয় এই মাসেই।

নিরানন্দ উৎসাহে সুরমা কাছে আসিল, কিন্তু কোনরূপ উপদ্রব করিল না—আমার মাথা খাও, সত্যি বল।

কি বিপদ, সত্যিই ত বলচি!

আমার মরামুখ দেখ—বল, পছন্দ হয়েছে?

হাঁ।

হঠাৎ যেন সুরমা আর কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না। বালক-বালিকারা ধমক খাইয়া কাঁদিবার পূর্বে যেমন এদিক-ওদিক ঘাড় নাড়িয়া একটা অর্থহীন কথা বলিয়া ফেলে, সুরমা তেমনি ছেলেমানুষটির মত মাথা হেলাইয়া গাঢ়স্বরে কহিল, তবে বলেছিলাম ত—

যজ্ঞদত্ত নিজের ভাবনায় ব্যস্ত ছিল, তাই বুঝিতে পারিল না যে, এ কথার একেবারে কোন অর্থই নাই; কেননা, প্রথমতঃ 'পছন্দই হবে' এমন কথা সুরমা কোনকালে উচ্চারণ করে নাই। দ্বিতীয়তঃ, সে নিজেও মেয়ে দেখে নাই বরং এমনটি সে মোটেই আশা করে না যে, এত অল্পে পছন্দ হইবে, এবং এত শীঘ্র সম্বন্ধ পাকা হইবে। তাই সে সমস্ত দিনটা নিজের ঘরে বসিয়া এই কথা তোলাপাড়া করিতে লাগিল।

দু'দিন পরে কিন্তু যজ্ঞদত্ত অনেক কথা বুঝিতে পারিল, কহিল, সুরো, এ বিয়ে দিও না দিদি।

সুরমা। বাঃ তা কি হয়? সব যে স্থির হয়ে গেছে।

যজ্ঞ। স্থির কিছুই নয়।

সুরমা। না, তা হতে পারে না, দুঃখীর মেয়েকে সুখী করবে এটাও ভেবে দেখ, বিশেষ কথা দিয়ে ফেরাবে?

যজ্ঞদত্তের প্রতুলকুমারীর মুখ মনে পড়িল, সহিষ্ণুতা ও শান্তভাবের নিগূঢ় ছায়া যেন সেদিন তাহার কালো চোখ দুটিতে সে দেখিতে পাইয়াছিল—তাই সে চুপ করিয়া রহিল, তবু যজ্ঞদত্ত অনেক কথা ভাবিতে লাগিল। সুরমার কথাই বেশী ভাবিল। বর্ষার দিনে বাদলপোকাগুলা হঠাৎ যেমন ঘর ভরিয়া দেয় তেমন তাহার মনটা যেন অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিল, কিন্তু তাহাদিগের নিভৃত বাসগহ্বরটা যেমন কিছুতেই খুঁজিয়া বাহির করা যায় না, তেমনি সুরমার মুখের কথাগুলো কোন্ গুপ্ত আকাঙ্ক্ষার ভিতর দিয়া দলে দলে বাহির হইতে লাগিল, সেইটাই খুঁজিয়া পাইল না। চোখে তার এমনি ঝাপসা জাল লাগিয়া রহিল যে, কোনক্রমেই সুরমার মুখখানি সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল না।

.

পাঁচ

বিবাহ করিয়া যজ্ঞদত্ত বধূ ঘরে আনিল।বিকারগ্রস্ত রোগী ঘরে লোক না থাকিলে যেমন সমস্ত শক্তি এক করিয়া জলের ঘড়াটার পানে ছুটিয়া গিয়া আঁকড়াইয়া ধরে, সুরমা তেমনি করিয়া নূতন বধূকে আলিঙ্গন করিল। নিজের যতগুলি গহনা ছিল পরাইয়া দিল, যতগুলি বস্ত্র ছিল সমস্ত তাহার বাক্সে ভরিয়া দিল। শুষ্কমুখে সমস্ত দিন ধরিয়া বধূ সাজাইবার ধুম দেখিয়া যজ্ঞদত্ত মুখ চুন করিয়া রহিল। গাঢ় স্বপ্নটা সহ্য হয়—কেননা, অসহ্য হইলেই ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু জাগিয়া স্বপ্ন দেখাটায় যেন দম আটকাইতে থাকে, কিছুতেই সেটা শেষও হয় না—ঘুমও ভাঙ্গে না। মনে হয় একটা স্বপ্ন, মনে হয় এটা সত্য, ‘আলো ও ছায়া’র দু’জনেরই এই ভাবটা আসিতে লাগিল। একদিন ঘরে ডাকিয়া যজ্ঞদত্ত কহিল, ছায়াদেবী!

কি যজ্ঞদাদা?

আলোমশাই বললে না?

মুখ নত করিয়া সুরমা কহিল, আলোমশাই!

যজ্ঞদত্ত দুই হাত বাড়াইয়া কহিল, অনেকদিন কাছে এস নাই—এস।

সুরমা একবার মুখপানে চাহিয়া দেখিল; পরক্ষণেই বলিয়া উঠিল, বাঃ, আমি ত খুব! বৌকে একলা ফেলে এসেছি। বলিতে বলিতে সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

রাগের মাথায় যদি হঠাৎ কোন অপরিচিত ভদ্রলোকের গালে চড় মারা যায়, আর সে যদি শান্তভাবে ক্ষমা করিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে মনটা যেমন খারাপ হইয়া থাকে, তেমনি ক্ষমাপ্রাপ্ত অপরাধীর মত তাহারও মনটা ক্রমাগত দমিয়া পড়িতে লাগিল। কেবলি মন হয়, সে অপরাধ করিয়াছে আর সুরমা প্রাণপণে ক্ষমা করিতেছে।

সুরমা সর্বাভরণা নববধূকে জোর করিয়া তাহার পার্শ্বে বসাইয়া দেয়। সন্ধ্যা হইলেই বাহির হইতে কট্ করিয়া তালা বন্ধ করিয়া দেয়। গালে হাত দিয়া যজ্ঞদত্ত ভাবিতে থাকে। বৌও কতক বুঝিতে পারে; সে সেয়ানা মেয়ে নয়, তবুও ত সে নারী; সাধারণ স্ত্রীবুদ্ধিটুকু হইতে ভগবান কাহাকেও বঞ্চিত করেন না। সেও সারা রাত্রি জাগিয়া থাকে। আজ আট দিনও বিবাহ হয় নাই, এরি মধ্যে যজ্ঞদত্ত একদিন প্রত্যূষে সুরমাকে ডাকিয়া কহিল, সুরো, বর্ধমানে পিসীমাকে বৌ দেখিয়ে আনি।

দামোদর-পারে পিসীমার বাড়ি। সেখানে পৌঁছাইয়া যজ্ঞদত্ত কহিল, পিসীমা, বৌ এনেচি, দেখ।

পিসীমা। ওমা, বিয়ে করেছিস বুঝি, আহা বেঁচে থাক। দিব্যি চাঁদপানা বৌ, এইবার মানুষের মত ঘর-সংসার কর্।

যজ্ঞ। সেই জন্যেই ত সুরো জোর করে বিয়ে দিলে।

পিসিমা। সুরো বুঝি বিয়ে দিয়েচে?

যজ্ঞ। সেই ত দিলে, কিন্তু কপাল মন্দ—বৌ নিয়ে ঘর করা চলে না।

পিসীমা। কেন রে?

যজ্ঞ। জানো ত পিসীমা, আমার নর-গণ, বৌয়ের হ' ল রাক্ষস-গণ। একসঙ্গে থাকলে গণৎকার বলে—বাঁচি না বাঁচি।

পিসীমা। ষাট ষাট, সে কথা—

যজ্ঞ। তখন তাড়াতাড়ি এসব দেখা হয়নি, এখন ত তোমার কাছে থাকবে, মাসে পঞ্চাশ টাকা পাঠাব, তাতে চলবে না পিসীমা?

পিসীমা। হ্যাঁ তা চলে যাবে। পাড়াগাঁয়ে বিশেষ কষ্ট হবে না। আহা, চাঁদের মত মেয়ে, ডাগর হয়েচে, হাঁরে যজ্ঞ, একটা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করলে হয় না?

যজ্ঞ। হতে পারে। আমি ভট্টাচার্যের মত নিয়ে যা ভাল হয় তোমাকে জানাব।

পিসীমা। তা জানাস বাছা।

সন্ধ্যার সময় বৌকে কাছে ডাকিয়া যজ্ঞদত্ত কহিল, তবে তুমি এখানেই থাক।

সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা।

যা তোমার দরকার হবে আমাকে জানিয়ো।

আচ্ছা।

তুমি চিঠি লিখতে জান?

না।

তবে কি করে জানাবে?

নববধূ গৃহপালিতা হরিণীর মত চক্ষু দুইটি স্বামীর মুখের উপর রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল। যজ্ঞদত্তও মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল।

পিসীমার বাটীতে বৌ ভোরে উঠিয়া কাজ করিতে লাগিল। বসিয়া থাকিতে সে শিখে নাই, নূতন লোক হইলেও সে পরিচিতের মত ঘরকন্নার কাজ করিতে শুরু করিল। দুই-চার দিনেই পিসীমা বুঝিলেন, এমন মেয়ে সবাই গর্ভে ধরে না।

বৌয়ের অনেক গহনা, পাড়াসুদ্ধ ঝেঁটিয়ে লোক তা দেখতে আসে।

কে দিয়েচে গা? তোমার বাপ?

না, বাপ-মা আমার নাই, ঠাকুরঝি দিয়েচেন।

দু-একজন সমবয়সীর সহিত ভাব হইলে তাহারা খুঁটিয়া খুঁটিয়া কথা বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তোমার ঠাকুরঝি বুঝি খুব বড়লোক?

হ্যাঁ।

সব গহনা তারি?

সব। তাঁর দরকার নেই, তিনি বিধবা, এ-সব পরেন না।

কত বয়স বৌ?

আমাদের চেয়ে কিছু বড়। তিনি জোর করে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন।

তোমার বর বুঝি তাঁর খুব অনুগত?

হ্যাঁ, তিনি সতীলক্ষ্মী, সবাই তাঁকে ভালবাসে।

.

ছয়

উপরের জানালা হইতে সুরমা দেখিল, যজ্ঞদত্ত বাড়ি ফিরিয়া আসিল, কিন্তু সঙ্গে বৌ নাই। ঘরে প্রবেশ করিলে কহিল, যজ্ঞদাদা, বৌকে কোথায় রেখে এলে?

পিসীর বাড়ি।

সঙ্গে আনলে না কেন?

থাক, কিছুদিন পরে আনলেই হবে।

কথাটা সুরমার বুকে বিঁধিল। দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। প্রিয়জনের সহিত তর্ক করিতে গিয়া হঠাৎ বচসা হইয়া গেলে যেমন দুইজনেই কিছুক্ষণ ক্ষুণ্ণমনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, এ দুইজনও কিছুদিন তেমনি চুপচাপ দিন কাটাইতে লাগিল। সুরমা কহে, নেয়ে খেয়ে নাও, অনেক বেলা হল। যজ্ঞদত্ত বলে, হাঁ এই যাই, এমনি করিয়াও কিছুদিন কাটিল। একসঙ্গে ঘর করিতে গিয়া চিরদিন এভাবে চলে না, তাই আবার মিল হইতে লাগিল। যজ্ঞদত্ত আবার আদর করিয়া ডাকিতে লাগিলেন—ও ছায়াদেবী! ছায়া কিন্তু আর আলোমশাই বলে না—যজ্ঞদাদা বলে, কখনও বা শুধু দাদা বলিয়াই ডাকে।

সুরমা একদিন কহিল, দাদা, প্রায় তিনমাস হতে চলল, এইবার বৌকে আনো। যজ্ঞদত্ত কাটাইয়া দেয়, হাঁ তা হবে এখন।

মনের ভাব বুঝিয়া সুরমা চুপ করিয়া থাকে।

পিসীর পত্র মাঝে মাঝে আসে। পিসী লেখেন, বৌয়ের ম্যালেরিয়া জ্বর হইতেছে, চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন। মনের ভাব বুঝিয়া যজ্ঞদত্ত কতকগুলো টাকা বেশী করিয়া পাঠাইয়া দেয়। আর মাস-খানেক কোন কথা উঠে না।

এমন সময় একদিন হঠাৎ চিঠি আসিল যে, পিসী মরিয়া গিয়াছে। যজ্ঞদত্ত বর্ধমানে চলিয়া গেল। যাইবার সময় সুরমা মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিল, বৌকে নিয়ে এস।

বর্ধমানে পিসীর শ্রাদ্ধশান্তি হইয়া গেলে একদিন দুপুরবেলা যজ্ঞদত্ত বারান্দায় দাঁড়াইয়া বাড়ি যাইবার কথা ভাবিতেছিল। উঠানে একটা ধানের মরাইয়ের পাশে, নতুন বৌ দাঁড়াইয়া, চোখে পড়িল। চোখাচোখি হইবামাত্র সে হাত দিয়া ইশারা করিয়া ডাকিল।

যজ্ঞদত্তও স্ত্রীর নিকটে পৌঁছিল।

কি?

আপনাকে কিছু বলব।

বেশ ত বল।

নতুন বৌ ঢোক গিলিয়া কহিল, একদিন আপনি বলেছিলেন যদি আমার কোন দরকার হয়—

যজ্ঞদত্ত। বেশ ত, কি দরকার বল?

বৌ। বাড়িতে সবাই বলাবলি কচ্ছিলেন, আমি বড় অলক্ষণা, তাই এখানে আর থাকতে ইচ্ছে করে না।

যজ্ঞদত্ত। কোথায় থাকতে চাও?

বৌ। কলকাতায় যদি কোন ভদ্র-পরিবারে স্থান পাই—আমি ত সব কাজ কত্তে পারি।

যজ্ঞদত্ত। তোমার নিজের বাড়িতে যাবে?

বৌ। আমার নিজের বাড়ি? সে আবার কোথা? তাঁরা কি আর থাকতে দেবেন?

যজ্ঞদত্ত হাত দিয়া স্ত্রীর মুখ তুলিয়া ধরিয়া কহিল, আমার বাড়িতে যাবে?

বৌ। যাব।

যজ্ঞদত্ত। সুরমা তোমার জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছে।

সুরমার কথায় তাহার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল,—ঠাকুরঝি আমায় মনে করেন?

যজ্ঞদত্ত। করেন বৈ কি।

বৌ। তবে নিয়ে চলুন।

জগতে একরকমের লোক আছে, তাহারা পরের সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার বুদ্ধি কিছুতেই খুঁজিয়া পায় না, কিন্তু এমন একটা সহজ বুদ্ধি রাখে যে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া নিজের সম্বন্ধে অপরের পরামর্শ মোটেই প্রয়োজন বোধ করে না। নূতন বৌটি এই শ্রেণীর। সে নিজের কথা নিজেই ভাবে—পরকে জিজ্ঞাসা করে না। ভাবিয়া কহিল, আপনাদের অকল্যাণ করবার বড় ভয় আমার, কিন্তু থাকি বা কোথায়? না হয়, আমি নীচেই থাকব, সব কাজকর্ম করতে নীচে থাকাই সুবিধের।

যজ্ঞ। উপরে কি তোমার থাকবার ঘর নেই?

বৌ। আছে, কিন্তু নীচের ঘরেই বেশ থাকবো।

যজ্ঞদত্ত আর কোন কথা কহিল না। ভাবিতে লাগিল যে, খুব বোকার মত ত এ কথাগুলো নয় এবং কয়েকবার মনে করিল, বলিয়া ফেলে যে সে অলক্ষণা নহে, রাক্ষসগণ প্রভৃতি মিথ্যা কথা। কিন্তু মিথ্যা কথার কারণটি কি, তা কি করিয়া বলা যায়! বিশেষ বাড়ি গিয়া সে তাহার অতীত এবং ভবিষ্যৎ ব্যবহারে যে বেশ মিল করিয়া তুলিতে পারিবে, সে ভরসাও মনে করিতে পারিল না।

.

সাত

সুরমা দেখিল বৌ আসিয়াছে। উগ্র নেশার প্রথম ঝোঁকটা কাটাইয়া দিয়া সে স্থির হইয়াছে। তাই বৌ দেখিতে বাড়াবাড়ি করিল না। শান্ত ধীরভাবে প্রিয়সম্ভাষণ করিল, মৌখিক নহে, অন্তরগত মঙ্গলেচ্ছা তাহার শুষ্ক মুখের উপর জ্যোতি ফিরাইয়া আনিল।

বৌ, কৈ ভাল ছিলে না ত?

বৌ মাথা নাড়িয়া কহিল, মাঝে মাঝে জ্বর হ’ ত।

সুরমা তাহার কপালের ঘাম মুছাইয়া বলিল, এখানে চিকিৎসা হলেই সব ভাল হয়ে যাবে।

দুপুরবেলা সুরমা সংবাদ পাইল যে, বৌয়ের জন্য নীচে ঘর পরিষ্কার হইতেছে। অপমানে তাঁহার চোখে জল আসিল। সংবরণ করিয়া যজ্ঞদত্তের কাছে গিয়া বলিল, দাদা, বৌ কি নীচে শোবে? তুমি কিছু বলবে না?

আর কি বলব? যার যা খুশি তা করুক।

সুরমা লজ্জা ও ধিক্কারে আপনাকে শাসন করিতে পারিল না, সম্মুখেই কাঁদিয়া পলাইয়া গেল। উপরের গোলযোগটা কিন্তু নীচে পৌঁছিল না।

নূতন বৌ নূতন করিয়া সংসারের কাজকর্ম লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সে সুরমার সব কাজগুলি নিজের হাতে তুলিয়া লইল। শুধু উপরে যায় না—স্বামীর সহিত দেখা করে না। ক্রমে সুরমাও উপর ছাড়িয়া দিল। বৌ প্রফুল্ল গম্ভীরমুখে কাজ করিত, সুরমা পাশে বসিয়া থাকিত। একজন দেখাইত কর্ম করিয়া কত সুখ, অপর বুঝিত কর্মস্রোতে অনেক দুঃখ ভাসাইয়া দিতে পারা যায়। দু'জনের কেহই বেশী কথা কহে না, তাহাদের সহানুভূতি ক্রমে গাঢ়তর হইয়া আসিতে লাগিল।

মাঝে মাঝে নূতন বধূর প্রায় জ্বর হয়, দুই-চারিদিন উপবাস থাকিয়া আপনি সারিয়া ওঠে। ঔষধে প্রবৃত্তি নাই, ঔষধ খায় না। সে-সময়ের কাজকর্মগুলা দাসদাসীতেই করে; সুরমা পারিয়া উঠে না, ইচ্ছা থাকিলেও সামর্থ্যে কুলায় না। সোনার প্রতিমা সুরমা দেবীর এখন সে রং নাই, সে কান্তি নাই, অত লাবণ্য দুই মাসের মধ্যে কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। বৌ মাঝে মাঝে বলে, ঠাকুরঝি, তুমি দিন দিন এমন হয়ে যাচ্ছ কেন?

আমি? আচ্ছা বৌ, শরীরটা ভাল করবার জন্যে আমি যদি বিদেশে যাই, তোমার কষ্ট হবে না ত?

হবে বৈ কি।

তবে যাব না?

না ঠাকুরঝি, যেয়ো না, তুমি ঔষধ খেয়ে এখানেই ভাল হও।

সুরমা স্নেহভরে তাহার ললাট চুম্বন করিল।

একদিন সুরমা যজ্ঞদত্তের খাবার সাজাইতেছিল। যজ্ঞদত্ত তাহার মলিন কৃশ মুখখানি সতৃষ্ণ চক্ষে দেখিতেছিল। সুরমা মুখ তুলিলে, সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, মনে হয় মলেই বাঁচি!

কেন? বলিতেই সুরমার চক্ষে জল আসিল। ভয় হয় আর কতদিন এ প্রাণটাকে বয়ে বেড়াতে হবে। বন্দুকের গুলি খাইয়া বনের পশু যেমন মাটি ছাড়িয়া আকাশে পলাইবার জন্য প্রাণপণে লাফাইয়া উঠে, কিন্তু আকাশ তাহার কেহ নয়, তাই সেই আশ্রয়শূন্য মরণাহত জীব শেষে চিরদিনের আশ্রয় পৃথিবীকেই জড়াইয়া ধরিয়া প্রাণত্যাগ করে, তেমনি ছটফট করিয়া সুরমা প্রথমে আকাশ পানে চাহিয়া দেখিল, তার পর তেমনি করিয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল, যজ্ঞদাদা, আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমার শত্রু, আমাকে আর কোথাও পাঠিয়ে দিয়ে, তুমি সুখী হও।

তখনি হয়ত দাসী আসিয়া পড়িবে, যজ্ঞদত্ত হাত ধরিয়া তাহাকে তুলিয়া ধরিল। সস্নেহে অশ্রু মুছাইয়া কহিল, ছিঃ, ছেলেমানুষি ক'র না।

অশ্রু মুছিতে মুছিতে সুরমা তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

.

আট

তার পরে একদিন সুরমা বৌকে টানিয়া কাছে লইয়া কহিল, বৌ, দাদা কি তোমাকে কখন কিছু বলেচেন?

বৌ সহজভাবে উত্তর দিল, কি আবার বলবেন?

তবে তুমি কখন তাঁর কাছে যাও না কেন? তোমার কি যেতে ইচ্ছা করে না?

বৌয়ের প্রথমটা লজ্জা করিতে লাগিল, পরে মুখ নত করিয়া কহিল, করে দিদি, কিন্তু যাবার ত জো নেই!

কেন বৌ?

তোমার কি মনে নেই?

কৈ না।

ওঃ, তুমি বুঝি ভুলে গেছ ঠাকুরঝি, আমার যে রাক্ষস-গণ, ওঁর নর- গণ।

কে বলেচে?

উনিই পিসীমাকে বলেছিলেন, তাইতে–

সুরমা শিহরিয়া উঠিল–এ যে মিছে কথা বৌ।

মিছে কথা?

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সে সুরমার মুখপানে চাহিয়া রহিল। সুরমা বার বার শিহরিয়া উঠিল–মিছে কথা বৌ, ভয়ানক মিছে কথা।

আমার বিশ্বাস হয় না, উনি মিছে কথা বলবেন।

সুরমা আর সহিতে পারিল না–দুই বাহুর মধ্যে দৃঢ় করিয়া আলিঙ্গন করিয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বৌ, আমি মহাপাতকী।

বধূ আপনাকে ছাড়াইয়া লইয়া ধীরে ধীরে কহিল, কেন ঠাকুরঝি?

উঃ, তা আর শুনতে চেয়ো না। আমি বলতে পারর না।

ঝড়ের মত সুরমা যজ্ঞদত্তের সম্মুখে আসিয়া পড়িল–বৌকে এমন করে ঠকিয়ে রেখেচ, উঃ, কি ভয়ানক মিথ্যাবাদী তুমি!

যজ্ঞদত্ত অবাক হইয়া গেল। ও কি সুরো!

কৃতবিদ্য তুমি, ছি ছি, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত।

যজ্ঞদত্ত অর্থ বুঝিল না, শুধু কটুকথা শুনিতে লাগিল।

কি ভেবে বিয়ে করেছিলে? কি ভেবে ত্যাগ করে আছ? আমার জন্য? আমার মুখ চেয়ে এই প্রতারণা করে আসচ?

সুরমা, পাগল হয়ে গেলে?

পাগল আমি? তোমার চেয়ে আমার জ্ঞান আছে, দাও আমাকে কোথাও পাঠিয়ে। সুরমার চক্ষু রক্তবর্ণ, হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, এক দন্ডও আমি থাকতে চাই না, ছিঃ ছিঃ!

যজ্ঞদত্ত চিৎকার করিয়া কহিল, কি বলচ?

বলচি তুমি মিথ্যাবাদী—প্রতারক!

নিমেষে যজ্ঞদত্তের মাথার ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠিল। অকারণে মনে হইল, তাহার ভিতরের অন্তরটা বাহির হইয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে ডাকিতেছে। জ্ঞানশূন্য হইয়া সে টেবিলের উপরিস্থিত ভারী রুলার তুলিয়া লইয়া চিৎকার করিয়া কহিল, আমি অধম, আমি প্রতারক, আমি মিথ্যাবাদী, এই তার প্রায়শ্চিত্ত করচি।

বিপুল বলের সহিত যজ্ঞদত্ত স্ব-মস্তকে ভীষণ আঘাত করিল। মাথা ফাটিয়া ঝরঝর করিয়া রক্তস্রোত বহিল। সুরমা অস্ফুটে ডাকিল, মাগো! তার পর অচৈতন্য হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল। যজ্ঞদত্ত তাহা দেখিল, দেখিল তার সমস্ত মুখ রক্তে ভাসিতেছে, চোখের ভিতর রক্ত ঢুকিয়া সমস্ত ঝাপসা বোধ হইতেছে। সে উন্মত্তের মত বলিয়া উঠিল, আর কেন? এই সময় পিছন হইতে কে ধরিয়া ফেলিল। ফিরিয়া দেখিল, স্ত্রী; কাঁদিয়া বলিল, তুমি? স্কন্ধের উপর মাথা রাখিয়া সেও মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

সুরমা যেমন করিয়া নীচে হইতে উপরে ছুটিয়া আসিল, নূতন বধূ তাহাতে আশ্চর্য ও শঙ্কিত হইয়া নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া সব কথা শুনিল, সব কাণ্ড দেখিল। অনেকখানি সত্য তাহার মাথার ভিতরে সূর্য্যের আলোকের ন্যায় প্রতিভাত হইল, তাহারও বক্ষ-স্পন্দন দ্রুত হইয়া আসিয়াছিল, চক্ষের বাহিরে কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি হইতেছিল, কিন্তু সে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বিপদের সময় স্বামীকে ক্রোড়ে করিয়া বসিল।

.

নয়

ছয় দিন পরে ভাল করিয়া জ্ঞান হইলে, সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, দাদা কেমন আছেন?

দাসী কহিল, ভাল আছেন।

আমি দেখে আসব। কিন্তু উঠিতে গিয়া আবার শুইয়া পড়িল।

দাসী কহিল, তুমি বড় দুর্বল, তাতে জ্বর হয়েছে, উঠো না, ডাক্তার বারণ করেছে।

সুরমা আশা করিল যজ্ঞদাদা দেখিতে আসিবে, বৌ দেখিতে আসিবে।

একদিন দুইদিন করিয়া ক্রমে এক সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল, তবু কেহ আসিল না, কেহ খোঁজও লইল না।

জ্বর সারিয়াছে, কিন্তু বড় দুর্বল। উঠিতে চেষ্টা করিলে হয়ত উঠিতে পারিত, কিন্তু বিষম অভিমানে তাহার শয্যাত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি হইল না। নিজের মনে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিত, চোখ মুছিয়া ভাবিত—তাহাদের আলো ও ছায়ার কাহিনী।

দীপ্ত আলো ও গাঢ় ছায়া লইয়া তাহারা খেলা আরম্ভ করিয়াছিল, এখন আলো নিভিয়া আসিতেছে। মধ্যাহ্নের সূর্য্য পশ্চিমে ঝুঁকিয়াছে, গাঢ় ছায়া তাই অস্পষ্ট ও বিকৃত হইয়া প্রেতের মত কঙ্কালসার হইয়াছে। অজানা অন্ধকারের পানে সে ছায়া যেন মিশিয়া যাইবার জন্য ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া সুরমা ঘুমাইয়া পড়িল।

গায়ের উপর তপ্ত হস্ত রাখিয়া কে যেন ডাকিল, দিদি!

সুরমা উঠিয়া বলিল, একি বৌ? চক্ষু তাহার রক্তবর্ণ, মুখ শুষ্ক, ওষ্ঠদ্বয় যেন কালিমাখা।—কেন বৌ, কি হয়েছে তোমার?

কি হয়েছে আমার! তুমি আমাকে এ-বাড়িতে এনেছিলে, তাই বলতে এসেচি দিদি, ছুটি দাও আমাকে। আমি যাব—

কেন দিদি, কোথা যাবে?

নূতন বধূ সুরমার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া লুটাইয়া পড়িল।

সুরমা দেখিল তাহার দেহ অগ্নির মত উত্তপ্ত।—একি! এ যে বড় জ্বর হয়েচে।

এমন সময় একজন দাসী চিৎকার করিয়া ছুটিয়া আসিল, দিদি, বৌ কোথা গেল? ওমা জ্বরের ঝোঁকে পালিয়ে এসেচেন! আজ আট দিন বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন। মা গো! কি করে এলেন?

আট দিন জ্বর! ডাক্তার দেখচে?

কেউ না দিদি, কেউ না, পরশুদিন সকালবেলাও বৌমা এক ঘণ্টা কলতলায় মাথা পেতে বসেছিলেন, এত মানা করলুম, কিছুতেই শুনলেন না।

সন্ধ্যার পূর্বে সুরমা যজ্ঞদত্তের ঘরে গিয়া কাঁদিয়া পড়িল, দাদা, বৌ আর বাঁচে না।

বাঁচে না! কি হয়েচে?

আমার ঘরে এসে দেখ দাদা, বৌ বুঝি বাঁচে না।

দুই-তিনজন ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া বলিল, প্রবল বিকার। সমস্ত রাত্রি বিফল পরিশ্রম করিয়া তাহারা ভোরবেলায় চলিয়া গেল।

সমস্ত রাত্রি যজ্ঞদত্ত মাথার শিয়রে বসিয়া রহিল, কতবার মুখের কাছে মুখ লইয়া গেল, বধূ কিন্তু স্বামীকে চিনিতে পারিল না।

ডাক্তার চলিয়া গেলে যজ্ঞদত্ত কাঁদিয়া উঠিল, বৌ, একবার চেয়ে দেখ, একবার বল ক্ষমা করলে?

সুরমা পায়ের উপর মুখ লুকাইয়া অস্ফুটে বলিল, বৌদিদি, কেন এ শাস্তি দিয়ে গেলে?

কে কথা কহিবে? সমস্ত মান, অভিমান, তাচ্ছিল্য, অবহেলা সরাইয়া দিয়া সে ধীরে ধীরে অনন্তে মিলাইয়া গেল।

সুরমা কহিল, দাদা কোথায়?

দাসী উত্তর করিল, কাল তিনি পশ্চিমে চলে গেছেন।

কবে আসবেন?

জানিনে, বোধ হয় শিগগির আসবেন না।

আমি কোথায় থাকব?

সরকারমশায়কে বলে গেছেন, যত ইচ্ছে টাকা নিয়ে তোমার যেখানে খুশি থেকো।

সুরমা আকশপানে চাহিয়া দেখিল, জগতের আলো নিভিয়া গিয়াছে—সূর্য্য নাই, চন্দ্র নাই, একটি তারাও দেখা যায় না। পাশে চাহিয়া দেখিল, সে অস্ফুট ছায়াটিও কোথায় সরিয়া গিয়াছে—চতুর্দিক ঘনান্ধকার, বক্ষ-স্পন্দন তাহার যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছে, চক্ষের জ্যোতি ম্লান ও স্থির হইয়া আসিতেছে।

দাসী ডাকিল, দিদি!

ঊর্ধ্বনেত্রে সুরমা ডাকিল, যজ্ঞদাদা!

তারপর ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িল।